উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের
দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ

ভূমিকা

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
রণ ধারা বাহি জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে,
ভেদি মরু পথ গিরি পর্ব্বত
যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
একের শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তারই বিচিত্র সুর ॥"

বস্তুতঃ ভারতের জনগঠনে কবিগুরুর "ভারততীর্থ" কবিতার উদ্ধৃতাংশটি পরম ও চরম সত্যকে প্রকাশ করিয়াছে। বৈদিক আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এখানকার তৎকালীন প্রাগার্য সমাজগুলির সহিত রক্ত-ভাব-ভাষার আদান প্রদান করিয়াছে। পরবর্তীকালে বৈদিক আর্যদের ভাষার সহিত প্রাগার্যদের ভাষার মেল বন্ধনে সৃষ্ট হইয়াছে সংস্কৃত ভাষা। আবার ভারতীয় সংস্কৃতির অর্থই হইল সংস্কৃত বা সংস্কৃতান্বিত সংস্কৃতি।[১] অন্যদিকে ইহাকেই আমরা হিন্দু সংস্কৃতি বা সভ্যতা বলিয়া জানি।[২]

বরেণ্য পণ্ডিতগণের মতে বিভিন্ন নরগোষ্ঠী ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের সমন্বয়ে বৃহত্তর ভারতীয় জনসমাজের সৃষ্টি। নিগ্রোবটু, আদি-অষ্ট্রেলীয় (বর্ত্তমান নাম ভেড্ডিড্), মঙ্গোলীয়, ভূমধ্যসাগরীয় (দ্রাবিড়ভাষী), ব্রেকিসেফালস্ (প্রশস্তশিরা) এবং নর্ডিক প্রভৃতি নরগোষ্ঠীর রক্তে ভারতীয় জনের গঠন হইয়াছে।[৩] ভাষা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এত সংখ্যা পাওয়া যায় না। ইন্দো-আর্য্য, অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষাভাষী গোষ্ঠীর সন্ধান ভারতবর্ষে মিলে।[৪] উত্তর পূর্ব্ব ভারতের কতক কতক জনসমাজে তিব্বত ব্রহ্ম দেশীয় বা ভোটব্রহ্মীয় ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়।[৫] সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে বৈদিক আর্যরা ভারতের মাটিতে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলে এখানকার প্রাগার্য লোকদের সহিত প্রাথমিক দিকে সংঘাত সংঘর্ষ ও পরবর্তীকালে সর্ব্বস্তরে একটি সমন্বয় সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় আচার্য শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাই বলিতেছেন, "ভারতবর্ষের সু-সভ্য, অর্ধ-সভ্য ও অ-সভ্য, সব রকমের অনার্য আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আর্যদের প্রথম সংস্পর্শ হয়তো বিরোধময়ই হইয়াছিল। কিন্তু অনার্য ভারতে আর্যদের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর হইতেই উভয় শ্রেণীর মানুষ অনার্য ও আর্য পরস্পরের প্রতিবেশ-প্রভাবে পড়িতে থাকে। আর্যরা বিদেশ হইতে আগত এবং পার্থিব সভ্যতায় তাহারা খুব উচ্চ ছিল না। আর্যদের ভাষা আসিয়া দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক ভাষাগুলিকে হীনপ্রভ করিয়া দিল; উত্তর ভারতের কোল ও দ্রাবিড় অনার্যদের মধ্যে ঐক্য বিষয়ক ভাষার অভাব ছিল, আর্য নরগোষ্ঠীর বিজেতৃ মর্যাদা লইয়া আর্যভাষা সে অভাব পূর্ণ করিল।"[৬] কিন্তু আর্য ও প্রাগার্যদের [আমরা অনার্য শব্দটির পরিবর্তে প্রাগার্য শব্দটি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। কেন না 'আর্য নহে' এইরূপ একটি অর্থ হইলেও শব্দটির মধ্যে হীনতাবোধক একটি ভাব প্রকাশ পায় বলিয়া মনে হয়।] এই ঐক্য স্থাপন খুব সহজভাবে হয় নাই।— "শতাব্দীর বিরোধ মিলনের মধ্য দিয়া...ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বুকে আর্যভাষীরা এক সমন্বিত জন, ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিল। সে জনের রক্ত বিশুদ্ধতা আর রহিল না, তাহার রক্তে বিচিত্র রক্তধারার স্রোতোধ্বনি রচিত হইতে লাগিল, কোথাও ক্ষীণ, কোথাও উচ্চগ্রামে। এই সমন্বিত জনের নাম ভারতীয় জন। সে ধর্ম্মও আর বেদ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম রহিল না, তাহার মধ্যে বিভিন্ন বিচিত্র পূর্ব্বতন ধর্ম্মের আদর্শ, আচার, অনুষ্ঠান সব মিলিয়া মিশিয়া এক নূতন ধর্ম গড়িয়া উঠিল; তাহার নাম পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম। সে সভ্যতাও বৈদিক আর্যভাষীর সভ্যতা থাকিল না; বিচিত্র পূর্ব্বতন সভ্যতার উপাদান উপকরণ আহরণ করিয়া তাহার এক নূতন রূপ ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল, এই নূতন সমন্বিত সভ্যতার নাম ভারতীয় সভ্যতা। আর সেই সংস্কৃতিই কি বেদ-ব্রাহ্মণের সংস্কৃতি থাকিতে পারিল? তাহার মানস-লোকে কত যে পূর্ব্বতন জন ও সংস্কৃতির

সৃষ্টি-পুরাণ, দেবতা-বাদ, ভয়-বিশ্বাস, ভাব-কল্পনা, স্বভাব-প্রকৃতি, ইতিকাহিনী, ধ্যান-ধারণা আশ্রয়লাভ করিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলকে আশ্রয় দিয়া, সকলের মধ্যে আশ্রয় পাইয়া, সকলকে আত্মসাৎ করিয়া,[৩] সকলের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া এই সংস্কৃতিও এক নূতন সমন্বিত রূপ লাভ করিল, তাহার নাম ভারতীয় সংস্কৃতি"।[৭]

ভারতীয় জন, ভারতীয় ধর্ম, ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায় যাহা বলিয়াছেন জন-ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রশ্নে বাঙলাদেশ সম্পর্কেও তাহা সমান ও সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। কেননা: 'ভারত হইতেছে সাধারণ, বাংগালার হইতেছে বিশেষ। যাহা লইয়া বাংগালীর বাংগালীত্ব, বাংগালীর অস্তিত্ব, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই ভারতবর্ষের অন্য জাতির মধ্যেও মিলে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের সঙ্গে সেইসব বিষয়ে বাংগালীদের সমতা আছে।"[৮]

পণ্ডিতগণের অভিমতে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে আর্যরা সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকের মধ্যে আর্যভাষা ও ধর্ম পশ্চিম পাঞ্জাব হইয়া পূর্ব্বদিকে বিহার অবধি প্রসারিত হয়।[৯] পরবর্তী কালে সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে তাহারা বাঙলা দেশে প্রবেশ করিয়াছে।[১০] কিন্তু বাঙলা দেশে আর্যভাষীদের আগমণের পূর্ব্বেই বাঙালী একটি বিশিষ্ট জাতি হিসাবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন।[১১]

বাঙলা দেশের 'জন' ও 'সংস্কৃতি' লইয়া মোটামুটি ভাবে গবেষকগণ কাজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং প্রাথমিক ভাবে তাঁহারা সফলতাও অর্জন করিতেছেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ সহকারে বাঙালীর ইতিহাসের অভাবের কথা বলিয়াছেন এবং বাঙলা দেশের সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস রচনার জন্য উপদেশও দিয়াছিলেন।[১২] এই ইতিহাস বলিতে তিনি রাজ্য-শাসন, সমাজব্যবস্থা, ধর্মবোধ, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় সম্বলিত একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের কথা বলিয়াছেন। পরবর্তীকালে এই জাতীয় একখানি ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের রচিত 'বাঙালীর ইতিহাস', আদিপর্ব্ব।[১৩] বস্তুতঃ বাঙলাদেশ ও জাতি সম্পর্কে ইদানীংকাল অবধি এই গ্রন্থখানি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। কিন্তু সমগ্র বাঙালীজাতির যাবতীয় বিষয় গ্রন্থভুক্ত করাতে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে উত্তর বঙ্গ তথা তদঞ্চলের প্রাচীন জনসমাজ কোচ রাজবংশীদের সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ডক্টর রায় সবিশেষ আলোকপাত করিতে অবকাশ পান নাই।

উত্তরবঙ্গ অঞ্চল বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত। অথচ 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ এবং 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে শ্রীগোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু উত্তরবঙ্গকে সম্পূর্ণ ভাবে অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থ দুইখানি সম্পূর্ণতঃ মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গ কেন্দ্রিক। কিন্তু উত্তর দক্ষিণ মধ্য সমগ্র অঞ্চলের সম্মিলিত সংস্কৃতিই পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। 'বাংলা' দেশ বলিতে ইদানীংকালের পশ্চিমবঙ্গ বুঝায়না; পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তর-দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ, অর্থাৎ দেশ বিভাগের পূর্বেকার বাঙলাই প্রকৃত বাঙলাদেশ। 'বাংলার লৌকিক দেবতা' নামটির মধ্যে অবশ্যই উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ দেবতাদেরও অন্তর্ভুক্তির কথা উঠে। এবং এইখানেই গ্রন্থ দুইটির নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেনা।

উত্তর পূর্ব্ব ভারতের আদিম বাসিন্দাদের সম্পর্কে নৃ-গোষ্ঠী ও ভাষাতত্ত্বের মানদণ্ডে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক ও প্রাথমিক আলোচনা করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্তি 'বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ' (ওরিজিন এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ) এবং 'কিরাত-জন-কৃতি' গ্রন্থের মধ্যে। প্রথমটির উদ্দেশ্য হইল বাংলাভাষার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা এবং দ্বিতীয় গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর একটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সঠিক তথ্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করা। ফলে উত্তর বাংলার জন-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অবকাশ তাঁহার ছিল না।

উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসুদের নিকট খান চৌধুরী আমানতুল্লা আহমেদ রচিত 'কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড' গ্রন্থখানি প্রচুর মান্য পাইয়া আসিতেছে। কোচবিহার রাজ্যের (অধুনা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের একটি জেলা বিশেষ) রাজবংশ, রাজ্যের অধিবাসীদের আচার ব্যবহার প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু জাতিগত উদ্ভব আলোচনায় গ্রন্থকার একটু মাত্রাধিক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াছেন। উপরন্তু গ্রন্থখানি রাজাদেশে বা রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রাজকোষের অর্থ ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে কোচবিহার রাজবংশের ইতিহাস প্রণয়ণের জন্যই ইহা সঙ্কলিত হইয়াছিল।[১৪] ফলে ঐতিহাসিকের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা তৎকালীন রাজা বাহাদুরের ব্যক্তিগত প্রভাব দ্বারা পরিচালিত হয় নাই তাহা অত্যন্ত জোরের সহিত বলিতে পারা যায়না।

উত্তরবাংলার আদি প্রাচীন সমাজ রাজবংশীদের সামগ্রিক বিষয় লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করিলেন জলপাইগুড়ি নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়। বস্তুতঃ বাংলার বাহিরে (এবং ভারতবর্ষেরও বাহিরে) রাজবংশী নামক সমাজটির পূর্ণ চিত্র তিনিই তুলিয়া ধরেন তাঁহার রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ 'দি রাজবাংশীজ অব নর্থবেঙ্গল' [১৫] অর্থাৎ 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী'-র মাধ্যমে। কিন্তু—(১) "উত্তরবঙ্গের রাজবংশী" গ্রন্থটির নাম হইলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি সমগ্র উত্তর বাঙলার কথা বলেন নাই। ভূমিকায় তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তরাই, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলের রাজবংশীদের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির একটা ধারণা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। [১৬] (২) গ্রন্থটি গবেষণা মূলক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া রচিত হয় নাই। একটি সমাজের বস্তুভিত্তিক তথ্যগুলির সঙ্কলন তিনি করিয়াছেন মাত্র, তথ্যগুলির আশ্রয় ও সহায়তায় তিনি গভীরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, (৩) অনেক সময় তিনি আকস্মিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ঘটনার যুক্তি দিয়াছেন, [১৭] (৪) রাজবংশীদের যাবতীয় বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া উক্ত সমাজটির ধর্ম্মবোধ আচার সংস্কৃতি সম্পর্কে মূলোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই।

তথাপি 'দি রাজবংশীজ অব নর্থবেঙ্গল'-এর সহিত গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় শ্রীসান্যাল মহাশয় বিশেষ প্রশংসা-ভাজন হইবেন। প্রাথমিক কাজ বলিয়া গ্রন্থখানিতে সামান্য কিছু পদ্ধতিগত (টেক্‌নিক্যাল) ভুল থাকা অসম্ভব নহে, কেননা তিনি অনুসন্ধান কার্য মাত্র চালাইয়াছেন। তাঁহার এই অমূল্য গ্রন্থখানিকে ভিত্তি করিয়া পরবর্ত্তী গবেষকগণ সুন্দর ও সুচারুভাবে কাজে হাত দিবার একটি খোলা পথ পাইতে পারেন। অবহেলিত তথা অপরিচিত একটি প্রাচীন সমাজের পরিচয়প্রদান ক্ষেত্রে তিনি জমি চাষ করিয়াছেন, বলা যায়; তাঁহার সেই কর্ষিত জমিতে পরবর্তী গবেষকেরা, ঐতিহাসিকেরা সোনার ফসল ফলাইতে সক্ষম হইতে পারিবেন।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পূর্ব্বে বিদেশী শাসকের কিছু কিছু কর্ম্মচারী উত্তর বাংলার তথা উত্তর পূর্ব্ব ভারতের আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না যে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস রচনা, সংস্কৃতি-সন্ধান, জনতত্ত্ব-নিরূপন, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা প্রভৃতি মহৎ কর্ম্মের সূচনা বিদেশী ইংরাজরাই করিয়াছিলেন। এতদপ্রসঙ্গে তাঁহাদের রচনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যাইতে পারে :—

	গ্রন্থকার—	গ্রন্থনাম—	প্রকাশকাল—খৃঃ
১।	ফ্রান্সিস্ ওয়াল্টার হ্যামিল্টন বুকানন—	ঈস্ট ইণ্ডিয়া গেজিটিয়ার—	১৮১৫— ,,
২।	মণ্টোগোমারী মার্টিন—	হিষ্ট্রি এ্যান্টিকুইটি টোপোগ্রাফি এ্যাণ্ড স্ট্যাটিষ্টিক্ অব ঈষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া—	১৮৩৮— ,,
৩।	বি, এইচ, হজসন্—	এসো অন কোচ-বোডো এ্যাণ্ড ধীমল ট্রাইবস্	১৮৪৭— ,,
৪।	কর্ণেল ডাল্টন—	ডেস্ক্রিপটিভ্ এথ্‌নোলজি অব বেঙ্গল—	১৮৭২— ,,
৫।	উইলিয়ম উইল্‌সন্ হাণ্টার—	স্ট্যাটিষ্টিক্যাল এ্যাকাউণ্ট অব বেঙ্গল—	১৮৭৬— ,,
৬।	এইচ, এইচ, রিজলী—	দি ট্রাইব্‌স্ এ্যাণ্ড কাস্টম্ অব বেঙ্গল—	১৮৯১— ,,
৭।	মিঃ ডি, এইচ, ই, সাণ্ডার, সেট্‌লমেণ্ট অফিসার—	সার্ভে এ্যাণ্ড সেট্‌লমেণ্ট অব দি ওয়েষ্টার্ণ ডুয়ার্স. ইন দি ডিষ্ট্রীক্ট অব জলপাইগুড়ি (১৮৮৯-৯৫) —	১৮৯৫— ,,
৮।	স্যার জর্জ এ্যাব্রাহাম গ্রীয়ার্সন—	লিঙ্গুয়িষ্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া—	১৯২৭— ,,

উল্লিখিত তালিকার গ্রন্থকারগণের মধ্যে একমাত্র স্যার এ্যাব্রাহাম গ্রীয়ার্সনেরই ভারতীয় ভাষা সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে নিবিড় পরিচয় ও জ্ঞান ছিল। অন্যান্যরা যেমন এখানকার স্থানীয় ভাষা বুঝিতেন না তেমনি সংস্কৃতি সংস্কার সম্পর্কেও বিশেষ অবহিত ছিলেন না বলিয়া মনে হয়। উপরন্তু পরাধীন জাতির, বিশেষতঃ অবহেলিত সমাজের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধিতচিত্ততার কারণ না থাকাই স্বাভাবিক। তথাপি বাঙলা তথা ভারতের অন্ধকার যুগের সংগৃহীত তথ্যগুলি পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের মূল্যবান উপাদান হিসাবে কাজে লাগে নাই ইহা বলা যায় না। তাঁহাদের আহৃত তথ্যগুলির মধ্যে সত্যতার অভাব বা ভ্রান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু অজ্ঞাত সমাজগুলির একটি মোটামুটি চিত্র গ্রহণ তাঁহাদের যে উদ্দেশ্য ছিল এবং তাঁহারা যে সফল হইয়াছেন ইহা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে।

উপর্যুক্ত তথ্যানুসন্ধানী ঐতিহাসিক গবেষক সকলের আহৃত উপাদানগুলির প্রতি পূর্ণ মর্য্যাদা দান করিয়াও আমরা বিনীতভাবে বলিতে চাই যে শ্রদ্ধেয় শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল ব্যতিরেকে অন্য কেহ প্রকৃতপক্ষে

উত্তরবঙ্গ এবং এখানকার বহুশতাব্দীকাল হইতে বসবাসকারী রাজবংশী সমাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ভাবে কোন চিত্র তুলিয়া ধরেন নাই। অথচ বৃহত্তর বাঙলাকে বুঝিতে হইলে কেবল দক্ষিণবঙ্গ সম্পর্কে জানিলেই চলে না, উত্তরবঙ্গকেও সম্যকভাবে জানিতে হইবে। এবং উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে প্রথমে যাহা সহজ লভ্য বলিয়া মনে হয় তাহার একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র রাজবংশী সমাজ। সুদূর অতীত হইতে দেশ বিভাগের পূর্ব্ববর্তীকাল পর্য্যন্ত যে বিশাল সময়রেখা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই কোচ —রাজবংশীদের কথাই মুখ্য হইয়া উঠে। কোনও একটি প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে সম্যক জানিতে হইলে উহার উদ্ভব-বিকাশ, অতীত আচার, ধর্ম্মবোধ ও সংস্কার সংস্কৃতির সহিত উহার বর্ত্তমান প্রবণতার তুলনা-মূলক পর্য্যালোচনা না করিলে সম্ভবতঃ সমাজ সম্পর্কে ধারণা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। বিশেষতঃ এই দৃষ্টি-ভঙ্গীটিকে আদর্শ করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রকল্পটি গ্রহণ করিয়াছি। কেননা দেবদেবীদের সংশ্লিষ্ট পূজা-পার্ব্বণের মধ্য দিয়াই রাজবংশী সমাজের ধর্ম্মবোধ, পূজা পদ্ধতি, সংস্কার, দেবতাদের প্রকৃতি, পূজা কেন্দ্রিক উৎসব, উৎসব কেন্দ্রিক সঙ্গীত, পূজায় ব্যবহৃত মন্ত্রাদি ইত্যাদি বিষয়ের একটি পূর্ণ চিত্র ফুটিয়া উঠিতে পারে। মূল বিষয়টিতে প্রবেশের পূর্ব্বে রাজবংশী সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কেও আমরা একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা যুক্ত করিয়াছি।

"বাঙ্গালীর উৎপত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র কোচ সমাজকে বাঙালী বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন :—"বহুতর কোচ বাঙ্গালার ভিতরেই বাস করিতেছে। দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় কোচদিগকে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ভিতরে প্রায় একলক্ষ কোচের বাস আছে। এই একলক্ষ কোচকে বাঙ্গালী বলা যাইবে কি না? কেহ কেহ বলেন ইহাদিগকেও বাঙ্গালীর সামিল ধরিতে হইবে। আমরা সে বিষয়ে সন্দিহান।"[১৮] সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক বা গবেষক ছিলেননা। তাই তাঁহার সন্দেহ অমূলক হইলেও তাঁহাকে সমালোচনার উর্দ্ধে রাখিয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-নমঃশূদ্র-চণ্ডাল-বাগ্দী-বাউরী-কৈবর্ত সমাজগুলি এবং মুসলমান যে অর্থে বাঙ্গালী, কোচ বা রাজবংশীরাও সেই অর্থে খাঁটি বাঙালী। রাজবংশীদের উদ্ভব সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা বলিতে চেষ্টা করিব যে সুদূর অতীতকাল হইতে সমাজটি বাঙ্গালা ভাষা ও কৃষ্টি গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। আমাদের মনে রাখা উচিত হইবে যে বাঙ্গালী সমাজ বলিতে বিশেষ কোন একটি ধর্মগত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে বুঝায় না। "বিচিত্র নর গোষ্ঠীর লোক লইয়া বৃহত্তর বাঙ্গালী জনের গঠন" হইয়াছে।[১৯]

পূর্বতন গবেষকেরা রাজবংশীদের উদ্ভব সম্পর্কে ঐকামতে পৌঁছাইতে পারেন নাই। কাহারও মতে ইহারা দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক নৃ-গোষ্ঠীর বংশধর, কাহারও কাহারও মতে মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার লোক। মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া কেহ বা সংকর-জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমাজটির উদ্ভব শীর্ষক আলোচনায় আমরা ইহাদিগকে মঙ্গোলীয় শাখার বংশধর বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের যুক্তি ও অনুমান যদি গ্রাহ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে বাঙলার সংস্কৃতিতে উত্তর বাঙলার একটি বিশেষ ভূমিকার কথা স্বাভাবিক-ভাবেই স্বীকার করিতে হইবে। কেননা ভারতীয় সংস্কৃতিতে মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর দান অপরিসীম।

ভারতবর্ষে মঙ্গোলীয় জনসমাজের এই অপরিসীম অবদান প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলিতেছেন যে নেপালে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং বাঙলা ও আসামে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, হিন্দুসেনানী ও সদাগরদের মাধ্যমে মঙ্গোলীয়রা হিন্দুকৃত বা ভারতীয়কৃত হইয়াছে। উহাদের ভাষা, ধারনা, আচার অনুষ্ঠান প্রথা ভারতীয় আর্য-অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের সম্মিলিত ভাষা, ধর্ম-আচার-সাংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তাঁহার মতে, বাঙলার হিন্দুধর্মের শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবীয় শাখাসমূহের আচার-অনুষ্ঠান-প্রথা, উত্তর পূর্ব-ভারতের লোকায়ত উৎসবাদি, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, অলংকরণ, বয়নশিল্প, পরিচ্ছদ, মুদ্রানির্মাণ, বাঙালীর মানসিকতা ও ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের উপর মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার প্রভূত প্রভাব পড়িয়াছে।[২০] সুতরাং রাজবংশীদিগকে মঙ্গোলীয় শাখার লোক ধরিলে ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে বাঙালী সমাজের উপর তাহাদের একটি প্রভাব পড়িয়াছে। কেননা, "আর্য সংস্কৃতি সম্প্রসারিত হয়ে প্রথম বাসা বাঁধে উত্তর বাঙলায়,"[২১] বা "বাংলাদেশে আর্যসভ্যতা বিস্তৃতির ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা-যায় যে, উত্তর বিহার বা মগধ হইতে ইহার সংলগ্ন অঞ্চল উত্তরবঙ্গেই আর্যসভ্যতা সর্বপ্রথম বিস্তৃতি লাভ করে।"[২২]

পশ্চিমবাঙলার সাধারণ জন-গঠনের সহিত উত্তর বাঙলার জন-গঠনের মূলতঃ কোন সাদৃশ্য নাই। "বাঙালীর জন প্রকৃতিতে এ পর্যন্ত যে সব উপাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বলা যায়, ভেড্ডীয় উপাদানই

বাংলার জন-গঠনের মূল ও প্রধান উপাদান। ····অধিকাংশ বাঙালীই মধ্যমাকৃতি—মাথার গড়ন দীর্ঘও নয়, গোলও নয়, নাসিকা দীর্ঘও নয়, প্রশস্তও নয়, দেহাকৃতি দীর্ঘও নয়, খর্বও নয়। এই মধ্যমাকৃতি দেহলক্ষণই বাঙালীর বৈশিষ্ট্য।"[২৩] অন্যদিকে উত্তর বাঙলার জনপ্রকৃতিতে সাধারণভাবে মঙ্গোলীয় রক্ত-প্রভাব অধিক বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।—"বাঙলাদেশের জনসাধারণের কোনও কোনও অংশে মঙ্গোলীয় রক্তের একটি ধারাও বিশেষভাবে নজরে পড়ে। ·····দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হইতে ইহারা ক্রমশ ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও পূর্ব দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দেশ ও দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পথে উত্তর-পূর্ব আসামে এবং উত্তর-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মিরি, নাগা, বোদো বা মেচ প্রভৃতি লোকদের ভিতর, কোচ, পালিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি লোকদের ভিতর ইহাদের একটি ধারাপ্রবাহ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাধৃত ধারাটির একটি প্রবাহ বাংলাদেশেও আসিয়া ঢুকিয়া পড়ে এবং রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে এইভাবেই খানিকটা মঙ্গোলীয় প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।"[২৪] এই মঙ্গোলীয় প্রভাবের দরুন বাঙালী জাতির অপরাপর শাখার ন্যায় দেহলক্ষণ মধ্যমাকৃতি হইলেও ইহাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে কয়েকটি ক্ষেত্রে। সাধারণভাবে ইহাদের নাক চ্যাপ্টা, চোয়াল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, চক্ষু ক্ষুদ্র এবং ভ্রু অন্যান্য বাঙালীর তুলনায় কম। এই সমস্ত বিষয়ে বৃহৎ মঙ্গোলীয় জাতিভুক্ত অন্যান্য শাখা গুলির সহিত রাজবংশীদের সাদৃশ্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

আর শুধু জনপ্রকৃতিতে নহে, উত্তর বাঙলার লোকভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও পশ্চিম বঙ্গের সহিত কোনরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা হওয়া দরকার। যাহা হউক পশ্চিমবঙ্গের ভাষা-সংস্কৃতি-জন-প্রকৃতির সহিত উত্তরবঙ্গের ভাষা সংস্কৃতি জনপ্রকৃতির এই বৈসাদৃশ্যের মুখ্য কারণ সম্ভবতঃ ইহার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য।

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ, কাব্য, তাম্রশাসন বিদেশী পর্য্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত, ঐতিহাসিকগণের বিবরণী ইত্যাদি হইতে জানিতে পারা যায় যে রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলটি বিভিন্নকালে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে, যথা প্রাগ-জ্যোতিষ, লৌহিত্য, কামরূপ, কামতাপুর প্রভৃতি[২৫]। কালিকা-পুরাণ-যোগিনীতন্ত্রে উল্লিখিত আছে যে করতোয়া নদীর পূর্ব্ব হইতে দিক্ষু পর্যন্ত এবং হিমালয় হইতে দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী লাক্ষার সঙ্গম পর্য্যন্ত এই বিশাল ভূখণ্ড কামরূপ দেশের অন্তর্গত ছিল। উভয় গ্রন্থে দেশের পরিমাণ ত্রিশ যোজন বিস্তার ও শত যোজন দীর্ঘ বলা হইয়াছে।[২৬] কোচবিহার রাজবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি মহারাজ নরনারায়ণের (রাজত্বকাল ১৫৩৩ হইতে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে) রাজত্বকালের একটি স্কেচ মানচিত্রে নেপালের মোরঙ্গ, বিহারের পূর্ণিয়া, মালদহ বাদে বর্ত্তমান সমগ্র উত্তরবঙ্গ, সমগ্র আসাম, মণিপুর, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানকে কোচবিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর পূর্ব্বভাগের কিছু অংশ একদা ভুটানের শাসনে আসিয়াছিল। বৃটিশের আগমনে ও হস্তক্ষেপে প্রায় দুই শতক পূর্বে মাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতের মানচিত্রটি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।[২৭] উপরন্তু দেশ ব্যবচ্ছেদের ফলে তাহা সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়। যাহা হউক কামরূপ কামতাপুর কোচবিহার রাজ্যগুলি রাজবংশী-প্রধান রাজ্য ছিল। উত্তরে দেবতাত্মা হিমালয়, পশ্চিম-দক্ষিণে অমৃতবাহিনী গঙ্গা নদী, দক্ষিণ-পূর্বে নদশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র দ্বারা বেষ্টিত ত্রিভুজাকৃতি এই বিশাল অঞ্চলটি পৃথক ভৌগোলিক পরিবেশে সীমাবদ্ধ থাকিবার দরুণ স্বভাবতঃই পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ভাষা-সংস্কৃতি হইতে একটি স্বতন্ত্র এবং প্রায় স্বাধীন ভাষা-সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কেননা,—"বিচিত্র নর গোষ্ঠির লোক লইয়া বৃহত্তর বাঙালীজনের গঠন। বাংলাদেশে বহুদিন পর্য্যন্ত ইহাদের অধিকাংশই ছিল কোমবদ্ধ, গোষ্ঠীবদ্ধ জন, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ইহারা একান্ত কৌমজীবনেই অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। এক-একটি কোম এক-একটি বিশিষ্ট স্থান লইয়া মোটামুটি ভাবে স্ব-স্বতন্ত্রপরায়ণ স্ব-সম্পূর্ণ জীবন যাপন করিত, অন্যকোমের সঙ্গে যোগাযোগ বড় একটা থাকিত না।"[২৮] নদী-নালা-খালবেষ্টিত পূর্ববঙ্গের পক্ষে ইহা যেমনভাবে প্রযোজ্য, তেমনতর ভাবে হিমালয় গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রদ্বারা সীমায়িত উত্তরবঙ্গ সম্পর্কেও তাহা নিঃসংশয়াতীত সত্য।

অধিকন্তু অন্য একটি বিষয় সম্পর্কেও আমাদের সজাগ থাকিতে হইবে। তাহা হইল উত্তরবঙ্গ সীমান্তবর্তী অঞ্চল। পূর্ব উত্তরে আসাম, উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে ভূটান ও নেপাল, পশ্চিমে বিহার। কাজেই সীমান্তবর্তী জাতি ও উপজাতিগুলির সহিত ইহার অধিবাসীদের একটা রক্ত ও সংস্কৃতি সংমিশ্রণের অনুমান অসঙ্গত হইবে না। বিশেষতঃ বোদো বা মেচ, ভুটিয়া, নেপালী এবং পূর্ণিয়ার রাজবংশীদের ভাষা সংস্কৃতির একটা সাধারণ প্রভাব অত্রাঞ্চলে পড়িবার অনুমান নেহাৎ কাল্পনিক নাও হইতে পারে। গঙ্গার দুই তীরের সভ্যতা সংস্কৃতি যদি পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ উভয়ের সভ্যতা সংস্কৃতির মিশ্ররূপ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই মিশ্র সংস্কৃতি মালদহ অঞ্চলের রাজবংশী সমাজে প্রভাবিত হয় নাই, ইহা বলা

যায় না। রাজবংশী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ প্রধানতঃ রঙপুর কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। উহা কালক্রমে সম্প্রসারিত হইয়া আসামের গোয়ালপাড়া এবং উত্তর বাঙলার অন্যত্র প্রবেশ করিয়াছে। ফলে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় সামান্যভাবে এবং মালদহ জেলাতে একটু অধিক পরিমাণে তাহাতে পরিবর্ত্তণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের নির্দ্দিষ্ট প্রকল্পটিতেও ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে।

মূল প্রকল্পটিতে প্রবেশের পূর্ব্বেই রাজবংশী সম্প্রদায়টি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কেননা সংশ্লিষ্ট সমাজটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত দেবদেবী ও পূজাপার্বন সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মিতে পারেনা বলিয়া মনে হয়।

বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের উত্তরাংশ, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা—কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ, পশ্চিমদিনাজপুর ও মালদহ এই পাঁচটি জেলাতেই রাজবংশী সম্প্রদায় সংখ্যাধিক। ইহা ব্যতীত আসাম প্রদেশের সম্পূর্ণ গোয়ালপাড়া জেলা, কামরূপ জেলার উত্তরাংশ ও নওগাঁ জেলার পশ্চিমাংশে এই সম্প্রদায় রহিয়াছে। নেপালের ভদ্রপুর, ঝাপা ও মোরঙ জেলাতে ইহাদের বসবাস আছে। অধুনা পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র রঙপুর ও পূর্বদিনাজপুর জেলাতে ইহাদের সংখ্যাধিক্য আছে। উত্তর পশ্চিম ময়মনসিংহ এবং রাজসাহী জেলার উত্তরাংশে রাজবংশী সম্প্রদায় বসবাস করে। উপরন্তু বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্বাংশ রাজবংশী অধ্যুষিত। আমাদের প্রকল্পটিতে সাধারণভাবে আমরা উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের রাজবংশীদের সম্পর্কেই আলোচনা করিতে সচেষ্ট হইব।

১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে একমাত্র পুরুলিয়া জেলা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের অন্য সব জেলাতেই রাজবংশীদের অবস্থানের কথা জানা যায়। পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ :—

কোচবিহার—	৪১৮৮৯৩	
জলপাইগুড়ি—	৩১৬০২০	
দার্জিলিং—	৩১৪৭২	৮৯৮১৯৯
পশ্চিমদিনাজপুর—	৯৩৩৭১	
মালদহ—	৩৮৪৪৩	
বর্দ্ধমান—	১১১৯৭	
বীরভূম—	৫৫৭৫	
বাঁকুড়া—	৩৯৮	
কলিকাতা—	২৭২৯	
হাওড়া—	৩৬২৪৬	
হুগলী—	২০১৬৫	
মেদিনীপুর—	৬৪৬১২	
মুর্শিদাবাদ—	২৯৭৪২	
নদীয়া—	১২৭৩৯	
২৪ পরগণা	১২০১২৪	
	১২০১৭০৬	

পরিসংখ্যানটিতে ধৃত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার রাজবংশী সমাজকে উদ্ভবের ক্ষেত্রে একই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে না। অন্যান্য জেলার রাজবংশীরা কৃষিজীবি হইলেও মূলতঃ মৎস্যজীবি, কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের একমাত্র জীবিকা কৃষিকর্ম। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের দেহ গঠন, ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত অপরাপর অঞ্চলের রাজবংশী সমাজের দেহ গঠন, ভাষা-সভ্যতা সংস্কৃতির সামান্য সাদৃশ্যও নাই বলিয়া মনে হয়।[২৯] উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের সহিত পূর্বে উক্ত রংপুর পূর্ব্বদিনাজপুর, গোয়াল পাড়া, নেপাল ও পূর্নিয়ার রাজবংশীদের দেহ গঠন, ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি একসূত্রে গ্রথিত, অর্থাৎ, একই মূল অংশ হইতে তাহা উদ্ভূত। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসবাসকারী মৎস্যজীবি রাজবংশীরাই ক্রমান্বয়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই একস্থানে উল্লেখ করিয়াছি যে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়কে আমরা মঙ্গোলীয় নৃশাখার লোক হিসাবে ধরিতে চাই। কোন কোন

গবেষক রাজবংশী সম্প্রদায়টিকে যে অষ্ট্রিক বা দ্রাবিড় শাখার লোক ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার মূল কারণ হয়তো উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশীদিগকে একই পর্যায়ে ফেলিবার প্রবণতা। বিষয়টি একটু পরিস্কারভাবে বলিতে চেষ্টা করা যাউক।

ই, টি. ডাল্টন,[৩০] ডব্লিউ ডব্লিউ হাণ্টার[৩১] এবং রিজলী[৩২] প্রমুখ বৃটিশ গবেষক রাজবংশী-দিগকে দ্রাবিড়ীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। ও, ডোনেল তাঁহার 'ভারতের আদমসুমারির বিবরণ (১৮৯১ খৃঃ)-এ মন্তব্য করিয়াছেন যে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের জাতিগত অবস্থা নির্ণয়ের বিষয়টি যদিও বিতর্কমূলক, তথাপি তাহাদিগকে পূর্ব্ব গিরিপথসমূহ দিয়া মঙ্গোলীয় জাতির তৃতীয় আগমণ ধারার শাখা ধরা যাইতে পারে।[৩৩] ইহার পূর্ব্বে বি, এইচ, হজসন তাঁহার "এস্যে অন্ কোচ বোডো এ্যাণ্ড ধীমল ট্রাইবস্ (১৮৪৯)[৩৪] এবং পরবর্তীকালে স্যার জর্জ অ্যাব্রাহাম গ্রীয়ার্সন 'লিঙ্গুয়িষ্টিক সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া' (১৯২৭)[৩৫] গ্রন্থে সমজাতীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার বহু পূর্ব্বে মহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন বখতিয়ার খিলজির গৌড়-কামরূপ আক্রমণের [৩৬] বিবরণ মূলক গ্রন্থ 'তবকাৎ-ই-নাসিরী"-তে "কোচমেচ থারু" সম্প্রদায়ত্রয়কে মঙ্গোলীয় শাখার লোক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[৩৭] পরস্পর বিরোধী এই দুই মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি তৃতীয় মতও প্রচলিত আছে। এই মতে বলা হয় যে বিষ্ণুপন্থী রাজবংশীরা দ্রাবিড়ীয় এবং শিবপূজক কোচসমূহ মঙ্গোলীয়।[৩৮]

প্রথম অভিমতটি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্বেই একটু আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মনে হয় উত্তরবঙ্গ ছাড়াও অন্যত্র রাজবংশী নামে সম্প্রদায় রহিয়াছে, তাহাদের সহিত আমাদের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট রাজবংশীদের কোনই সাদৃশ্য নাই, সম্ভবতঃ দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশীদের সহিত উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের গুলাইয়া ফেলিবার দরুণ এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। তৃতীয় মতটিও আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছিনা। কেননা এইসব অভিমতের জন্ম হইয়াছে রাজবংশী সমাজের নেতা রায়সাহেব পঞ্চানন বর্ম্মা কর্তৃক রংপুরে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের পরবর্তীকালে। রাজবংশী সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এখনও কোচ ও রাজবংশী বলিতে পৃথক জাতি বুঝিয়া থাকেন। রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী তৎকালীন রংপুর ধর্মসভার পণ্ডিতগণ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল।[৩৯] গণআন্দোলনের নিকট তৎকালের আদমসুমারি বিভাগের অধ্যক্ষরা যে প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ ও, ম্যালের একটি মন্তব্য। তিনি বলিতেছেন: 'কোচ হইতে রাজবংশী জাতি ভিন্ন' এই দাবী অসঙ্কোচে মঞ্জুর করা হইল। জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে যতই প্রশ্ন থাকুক, আজ ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে রাজবংশী ও কোচ পৃথক জাতি।[৪০]

রাজবংশীদের উদ্ভবের বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় মতটিকেই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ ইহারা মঙ্গোলীয় জাতির শাখা বিশেষ। আসাম, ব্রহ্মদেশ, ত্রিপুরা, নেপাল এবং হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত স্থানগুলির লোকদের মধ্যে যে মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার দৈহিক আকৃতির বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়কে বিচার করিলে এই মতের সমর্থন না করিয়া পারা যায় না। পরবর্তীকালে ইহাদের সহিত অষ্ট্রিক দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মিশ্র জাতি বাঙ্গালীদের সহিত রক্তসংমিশ্রণ ঘটিতে পারে। তাহার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রাজবংশীরা যে ভাষায় কথা বলিয়া থাকে সেটি বাংলা ভাষারই এক বিশিষ্ট উপভাষা।

ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশীদিগকে মঙ্গোলীয় নৃ-জাতির তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাষা-শাখার লোক বলিয়াছেন। অতএব এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে রাজবংশীরা কখন উত্তরবঙ্গে বসতি স্থাপন করে এবং কখন তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বাংলাকে নিজের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও বিতর্কমূলক, ফলতঃ সমাধানের প্রশ্নে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা কম থাকিলেও আমরা আনুমানিক একটি আপাতঃ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। কেননা বিষয়টি স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে গবেষণার অপেক্ষা রাখিতে পারে।

ভাষাচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীচট্টোপাধ্যায় অনুমান করিয়াছেন যে খৃষ্টাব্দ গণনার সময়েই আসাম, পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাষাশাখার বৃহৎ বোড়োজাতির মেচ-কোচ-কাছারি প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি বসতিস্থাপন করে।[৪১] অন্যদিকে চতুর্থ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মৌর্য শাসনের সময় বাংলাদেশে আর্যীকরণ আরম্ভ হয় এবং সম্ভবতঃ গুপ্ত শাসনের কালে সপ্তম খৃষ্টাব্দে তাহা প্রায় সম্পূর্ণ হয়।[৪২] সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে আর্যভাষীরা এবং উহার কিছু কাল পরে তিব্বত ব্রহ্মীয় ভাষীরা যদি বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়া থাকে বা অনুমান করা যাইতে পারে, তাহা

হইলে ইহাও অনুমান করিতে অসুবিধা নাই যে বাংলাদেশে আর্যভাষী বনাম প্রাগার্যভাষীদের ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির সংঘাত সমন্বয় গ্রহণ বর্জ্জন যখন চলিতেছিল, তখন উহাতে আর্যপর তিব্বত-ব্রহ্মীয় ভাষাশাখার লোকদেরও একটা সবিশেষ ভূমিকা বর্ত্তমান ছিল। উপরন্তু সপ্তম খৃষ্টপর শতকের দিকে বাংলাদেশে আর্যভাষা সভ্যতা সংস্কৃতি যদি মোটামুটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে এই সময়ের মধ্যেই আর্যভাষা সভ্যতা সংস্কৃতি তিব্বত ব্রহ্মীয় ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন্-সাঙ-এর বিবরণী। এতদপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলিতেছেন :

"হিউ-এন-সাঙের সাক্ষ্য হইতে বলা যাইতে পারে যে সপ্তম শতাব্দের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে মোটামুটিভাবে আর্যভাষা গৃহীত হইয়াছে···। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে মধ্যভারতের ভাষা হইতে কামরূপের ভাষার মধ্যে তিনি সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন।... বাংলা ও আসামী ভাষার বর্ত্তমান নিদর্শন হইতে যে কেহ ধারণা করিতে পারে যে ৭ম শতকে মধ্য-উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্দ্ধণ, উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিম আসাম অর্থাৎ কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চল একই তুল্যভাষা ব্যবহৃত হইতে পারে। আর্যভাষার উচ্চারণরীতি হইতে পরিবর্ত্তনজনিত এই সামান্য পার্থক্যটি সম্ভবতঃ মাগধী প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষার লক্ষণ বলা যাইতে পারে— "[৩৩]

অতএব খৃষ্টপর সপ্তম শতকেই রাজবংশীরা আর্যভাষার শাখা বাঙলাকে গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় যে কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাও ভাষাচার্য নির্দ্দেশিত মাগধী প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষার লক্ষণ বলিতে পারা যায়।

বৃটিশ সরকারের বেঙ্গল এষ্টাব্লিশমেন্টের চিকিৎসক ফ্রান্সিস্ হ্যামিল্টন বুকানন ১৮০৭ হইতে ১৮১৪ এই দীর্ঘ ৭ বৎসর কাল পূর্ব ভারতের স্থানগুলি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ পূর্ব ভারতের অজ্ঞাত ও অবহেলিত উপজাতিগুলির পরিচয় সর্বপ্রথম বুকাননই তুলিয়া ধরেন। পরবর্তীকালের গবেষকেরা তাঁহার প্রদত্ত বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়াই রাজবংশী ও অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বুকানন সাহেবের মতে বেশীর ভাগ রাজবংশীই কোচ এবং তাহারা একই মূল বংশ হইতে উদ্ভূত।[৪৪] এইচ, রিভারলী এই মত সমর্থন করিয়াছেন।[৪৫] রিজলীর মতে কোচ, রাজবংশী, পলিয়া, দেশিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় একই শাখার লোক।[৪৬] এ-ই-পার্টার এই মত স্বীকার করিয়াছেন।[৪৭] শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে কোচরা নিজেদের রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে।[৪৮] আমরা দৈহিক গঠন, ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই মতকে সমর্থন করিতে চাই। বস্তুতঃ এই বিষয়গুলিতে কোচ-রাজবংশী পলিয়াদের মধ্য সামান্যতম স্বাতন্ত্র্যও পরিলক্ষিত হয়না। অবশ্য যদি কোথায়ও ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে আঞ্চলিক প্রতিবেশ প্রভাবের দরুণ হইয়া থাকিতে পারে।

পলিয়া সমাজকে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য করিলেও[৪৯] কোচ সমাজকে অভিন্ন বলিয়া মানিয়া লইতে দেখা যায়না। রাজবংশী সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রতিষ্ঠান ক্ষত্রিয় সমিতি। স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই কোচ ও রাজবংশী যে পৃথক জাতি এবং তাহারা যে ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত এই আন্দোলন ক্ষত্রিয় সমিতির মাধ্যমে চলিয়াছিল।[৫০] পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে তাহাদের প্রথম দাবীটি তৎকালীন জন-গণনা অধিকারিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল। আমরা প্রধানতঃ কয়েকটি কারণে এই দাবী মানিয়া লইতে পারিতেছিনা। প্রথমতঃ রাজবংশী ও কোচের দৈহিক গঠন অভিন্ন, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে মঙ্গোলীয় প্রভাব প্রচুরভাবে বর্তমান; দ্বিতীয়তঃ—উভয় সমাজের মধ্যে বহুপূর্বে হইতেই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন প্রচলিত; তৃতীয়তঃ—উভয়ের ধর্ম-কৃষ্টি-সভ্যতা-সংস্কৃতি-ভাষা-সাহিত্য, জীবনযাত্রা প্রণালী, অর্থাৎ সমস্ত কিছুই সম্পূর্ণতঃ অভিন্ন; চতুর্থতঃ—যে সকল যুক্তির ভিত্তিতে রাজবংশীরা নিজেদের ক্ষত্রিয়বলিয়া দাবী করে, সেই সকল যুক্তিতে কোচগণও নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী জানায়। রাজবংশীদের প্রধান দাবী তাহারা পরশুরামের অত্যাচারে আত্মগোপন হেতু হিমালয়ের পাদদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়। কোচগণেরও দাবী, তাহারা পরশুরামের ভয়ে ভগবতীর কোচে অর্থাৎ কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে, অথবা সংকুচিত হয়, কিংবা সংকোচ[৫১] নদীর তীরে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। এই কোচ, সঙ্কোচ বা সংকোচ হইতে কোচশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া তাহাদের ধারনা।[৫২] অর্থাৎ উভয়ে ক্ষত্রিয় জাতির অংশ এবং পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধনজনিত ভয়ে উত্তরবঙ্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং কোচ ও রাজবংশী নিঃসংশয়িতভাবে অভিন্ন।

কোচ রাজবংশী পলিয়া সমাজত্রয়কে অভিন্ন হিসাবে গণ্য করিলে স্বাভাবিকভাবেই পূর্বোক্ত সংখ্যাটি কিছু বাড়িতে পারে। বিগত আদমসুমারীতে ৩৫২২ জন কোচ এবং ৭৩৯৯৭জন পলিয়া দেখান হইয়াছে। সুতরাং সমাজত্রয়ের মোট মিলিত সংখ্যা দাঁড়াইবে ৮৯৮১৯৯ রাজবংশী+৭৭৫১৯ কোচ-পলিয়া=১৮৮৩৯১৭ জন। আমাদের সংশ্লিষ্ট সমাজ রাজবংশী বলিতে এই সমাজত্রয়কেই বুঝান হইবে।

কোচ ও রাজবংশী শব্দ দুইটির মধ্যে আমরা কোচ নামটিকেই আদি ও প্রকৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চাই। দিনাজপুর হইতে প্রাপ্ত ৮৮০ শক অর্থাৎ ৯৭৬ খৃষ্টাব্দের বানগড় শিলালিপিতে কাম্বোজ রাজবংশের জনৈক গৌড়াধিপতি কর্তৃক শিবমন্দির স্থাপনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে আধুনিক কালের কোচকেই যে বুঝান হইয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। [৩] ভাষাচার্য্য শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে কোচ শব্দটিরই সংস্কায়িত রূপ কম্বোজ [৪] এবং যোগিনীতন্ত্র ও পদ্মপুরাণে যাহা 'কুবাচ' ও 'কুবাচক' হইয়াছে। [৫] ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত দেবীবর মিশ্রের 'মেলবিধি' এবং ধ্রুবানন্দ মিশ্র লিখিত 'কুল-কারিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে কোচ বা কোচক জাতির উল্লেখ আছে। [৬] সপ্তদশ শতকের 'তারিখে আসাম', ও 'আলমগীর নামা', অষ্টাদশ শতাব্দীর 'রিয়াজোস সালাতিন, ঊনবিংশ শতকের 'মোরসেদ জাহাঁনামা' প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিত গ্রন্থে এতদঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া কোচ ও মেচ ব্যতীত অন্য কোন জাতির উল্লেখ নাই। [৭] ত্রয়োদশ শতকে লিখিত মিনহাজুস-সিরাজএর 'তবকাৎ-ঈ-নাসিরী' হইতে প্রমাণ মিলে যে তৎকালে কামরূপ 'কোচ-মেচ-থারু' সম্প্রদায়ত্রয় দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। [৮] উপরন্তু বাঙলা মঙ্গল কাব্যগুলিতে কোচ রমনীর প্রতি শিবের আসক্তির প্রসঙ্গও স্মরণীয়। লক্ষ্যণীয় উল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে বা এই সময়ে রচিত অন্য কোন গ্রন্থে রাজবংশী বলিয়া কোন জাতির নাম পাওয়া যায় না। কালিকাপুরাণ, ভ্রামরীতন্ত্র নামে পুরাণ বা উপপুরাণদ্বয়কে সুপ্রাচীন কালের না ধরিলে ইহাদের মাধ্যমে আমদানীকৃত 'রাজবংশী' শব্দটিকেও অনায়াসেই অর্বাচীন ধরিতে হয়। ফলে কোচ নামটিকেই আদি ও প্রকৃত না ধরিয়া কোন উপায় থাকে না।

রাজবংশীরা সম্পূর্ণতঃ কৃষিনির্ভর এবং ইহাদের অর্থনৈতিক জীবন অত্যন্ত নিম্ন মানের। ইহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ ভাবে হয় নাই। [৯] দরিদ্রতম বলিয়া ঘরবাড়ী, আসবাব-সামগ্রী, পোষাক-পরিচ্ছদ, জীবনযাত্রা প্রণালী [১০] সকল কিছুই সাধারণ এবং বিলাসিতা ইহাদের মধ্যে এখনও প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। বিষয়গুলি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল মোটামুটি সম্পূর্ণ ও সুন্দর ভাবে 'দি রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল' গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের সহিত অত্রাঞ্চলের অন্যান্য জাতি ও উপজাতিগুলির অর্থ নৈতিক জীবন লইয়া স্বাধীনভাবে গবেষণা কার্য চলিতে পারে। পাছে মূল প্রকল্পটির ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয় তাই এই বিষয়টি লইয়া আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হইতে বিরত থাকিতেছি।

রাজবংশীদের ধর্ম্ম সম্পর্কে প্রায় সকল [১১] বরেণ্য পণ্ডিতগণের একটি বিশেষ মনোভাব কাজ করিয়াছে যে কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বিশ্বসিংহের আমলে [১২] তাহারা হিন্দুকৃত হইয়াছে। আমরা এই মনোভাবটিকে সমর্থন জানাইতে ইতস্ততঃ বোধ করিতেছি। কেননা: "...ভারতীয় সাংস্কৃতিক জনতত্ব ও সমাজতত্বের আলাপ-আলোচনা যত অগ্রসর হইতেছে ততই আমরা স্পষ্ট জানিতেছি যে, আজ আমরা যাকে হিন্দু ধর্ম্মকর্ম্মসাধনা বলিয়া জানি তাহা একদিকে আর্য ও অন্যদিকে প্রাক্ আর্য বা অনার্য ধর্ম্মকর্ম্মসাধনার সমন্বিত রূপ মাত্র। [১৩] বস্তুতঃ, আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনায় যথার্থ আর্য প্রবাহ ক্ষীণ; ক্রমে ক্রমে কালে কালে নানা বিচিত্র প্রবাহ সে প্রবাহে সমন্বিত হওয়ার ফলে আজ সে প্রবাহ প্রশস্ত ও বেগবান" [১৪]। অথবা "ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্যেরা যাদের দেখা পেলেন, তাদের ডাকলেন তাঁরা 'অন্যব্রত' বলে। এটা ঠিক যে আর্যেরা আসবার আগে এদেশে দলে দলে এইসব 'অন্যব্রত'...—নিজেদের আচার অনুষ্ঠান দেবতা অপদেবতা কলাকৌশল ভয় ভরসা হাসি কান্না নিয়ে বাস করছিল। এবং এটাও ঠিক যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যাঁরা এলেন এবং এদেশের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সেই আর্য এবং না-আর্য বা 'অন্যব্রত'দের মধ্যে সব দিক দিয়ে, এমনকি বিয়েতে এবং ভোজেতেও আদান প্রদান চলেছিল। পুরাণের দেবদেবীদের উৎপত্তির ইতিহাস এই আদান প্রদানের ইতিহাস, ধর্ম্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই;..." [১৫] সুতরাং পঞ্চদশ শতকের পূর্ব্বেকার রাজবংশী অর্থাৎ কোচ সাম্প্রদায়কে কেন যে অহিন্দু ভাবিতে হইবে বা তৎকালে প্রচলিত এই সমাজের ধর্ম্মকর্মানুষ্ঠানসমূহকে কেন যে অহিন্দুজনোচিত ভাবিতে হইবে তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। আমাদের পূর্ব্বে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজবংশীদিগকে মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার লোক ধরিলেও

ইহাদিগকে অ-হিন্দু বলিয়া কল্পনা করা উচিত হইবেনা। কারণ, প্রথমতঃ, হিন্দুধর্ম্মসভ্যতাসংস্কৃতিতে ইহাদের অবদান অনস্বীকার্য, [৬৬] দ্বিতীয়তঃ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাংলাদেশে যখন আর্যীকরণ চলিতেছিল তখনই হিন্দু ধর্ম্মভাষাসংস্কৃতিকে রাজবংশীরা গ্রহণ করিয়াছিল। তাই, যে কারণে রাজবংশীদিগকে আমরা বাঙালী বলিতে চাহিয়াছি, সেই কারণেই ইহাদিগকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করা সমীচিন হইবে বলিয়া মনে করি। হিন্দুধর্ম্ম বলিতে বিশেষ কোন একটি প্রথা বা বিশ্বাস বুঝায়না, নানাবিধ বিশ্বাস ও প্রথার সমন্বিত রূপ হিন্দুধর্ম্ম। [৬৭] উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় অবশ্যই হিন্দু এবং তথা বাঙালী, অর্থাৎ বাঙালী হিন্দু। ফলতঃ বাংলাদেশের অন্যান্য হিন্দু শাখার সহিত ইহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও আচার অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য থাকা একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যথাস্থানে লক্ষ্য করিতে পারিব যে আঞ্চলিকতার দরুণ কতক কতক ক্ষেত্রে রাজবংশীদের দেবদেবী ও আচরিত ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানের একটি স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। দেশ ও কাল অনুসারে এই স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বদেশেই ঘটিতে পারে। এবং বলা চলে এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যই আমাদিগকে বর্ত্তমান প্রকল্পটি গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

"আর্য এবং আর্য-পূর্ব্ব দুজনেরই সম্পর্কে যে পৃথিবীতে তারা জন্মেছে তাকেই নিয়ে, এবং দুজনেরই কামনা এই পৃথিবীতেই অনেকটা বদ্ধ ধন ধান সৌভাগ্য স্বাস্থ্য [৬৮] দীর্ঘজীবন এমন সব পার্থিব জিনিস; ·····।"[৬৯] তাই হিন্দু অ-হিন্দু জাতিমাত্রেরই কামনা-বাসনা ভর ভরসা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে বলা যায়। সম্ভবতঃ 'ধর্ম্ম' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্যও তাহাই, অর্থাৎ যাহা জীবনকে সুন্দর ও সুচারুরূপে ধারণ করিয়া রাখে বা যাহাকে ধারণ করিয়া সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে জীবন পরিচালনা করিতে পারা যায়।[৭০] রাজবংশী সমাজের প্রার্থনীয় কামনা বাসনাও একান্তভাবে পার্থিব এবং অতএব জীবনের প্রয়োজনীয়তাকেন্দ্রিক।

আমাদের প্রকল্পধৃত রাজবংশী সমাজটি, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সম্পূর্ণতঃ কৃষি নির্ভর, ফলতঃ উপনিষদের 'পঞ্চকোষ'তত্ত্বের 'অন্ন-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান আনন্দ' সকল কিছুই কৃষিকর্মের মধ্যে নিহিত বা সীমিত। ইহাদের প্রায় সকল দেবদেবীর পরিকল্পনা, পূজা-উৎসবাদি এবং পূজা ও উৎসবকেন্দ্রিক সঙ্গীত ইত্যাদি কৃষিকৃত্যের আধারে রূপ লাভ করিয়াছে। বিশুয়া, বৈশাখী-আষাঢ়ী সেবা, আমাতি, ধানের ফুল আনা, ক্ষেতিলক্ষী পূজা, পুষুনা, বুড়াবুড়ী, চড়ক ইত্যাদি পূজা ও উৎসবকে সম্পূর্ণভাবে কৃষিপূজাই বলিতে হয়। সংবৎসরের বিভিন্ন কালে কৃষিকার্যের স্তর-ভেদে এই সকল কৃত্য সমাজমনে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। অনাবৃষ্টিজনিত কৃষিকর্মের অসুবিধা দূরীকরণার্থ হুদুমদেও ঠাকুর পূজা এবং তাহার আনুষঙ্গিক কৃত্যাবলীর সৃষ্টি হইয়াছে। নদ-নদীর প্লাবনের প্রাবল্য যেমন মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর অসুবিধা সৃষ্টি করে, ফসলের প্রভূত ক্ষতির কারণ হয়, তেমনই জমির উর্ব্বরত্ব বৃদ্ধিরও সহায়ক হইতে পারে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে প্রচলিত নদী পূজা তিস্তাবুড়ী পূজা এবং তৎসংশ্লিষ্ট মেচেনী খেলা নামীয় সঙ্গীত শাখাটিকেও কৃষিকৃত্যের পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্রই গ্রামঠাকুর তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।[৭১] উত্তরবঙ্গেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। অত্রাঞ্চলেও গ্রামঠাকুর বিভিন্ন নামে ও বিভিন্নভাবে পূজা পাইয়া থাকেন। এই পূজা সাধারণতঃ কর্ষিত জমি রোপণযোগ্য হইলে পর, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের দিকে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ হৈমন্তিক ধানের বীচন বা চারাগাছ জমিতে প্রোথিত করিবার পূর্বেই গ্রামঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়। সুতরাং ইহার সহিতও কৃষির সম্পর্ক সুনিবিড়। থানচিরি অর্থাৎ স্থানশ্রীরও সঙ্গে কৃষির ঘনিষ্ঠতা বর্তমান, কেননা আনুষ্ঠানিক ধান্যচ্ছেদনের পর শীষগুলি তাহার প্রতীক বংশদণ্ডে বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের মুখ্যতম দেবতা হইলেন শিব। এই অঞ্চলের শৈবধর্মই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অন্যত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন। এতদপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মূল্যবান মন্তব্যটি স্মর্তব্য : "কোচ কৃষক সমাজেই বাংলার লৌকিক শৈবধর্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাংলার বহু দূরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যেও শিবকে কোচ রমনীদিগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাংলার সর্বত্র প্রচলিত লৌকিক শিবের ছড়ায় কোচনী রমনীর প্রতি শিবের আসক্তির বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। অতএব মনে হয়, কোচ জাতীয় কৃষকদিগের সমাজেই পৌরাণিক শিব সর্ব্বপ্রথম আসিয়া প্রবেশ লাভ করেন; অতঃপর সেখানেই তাঁহার চরিত্র স্থানীয় কোচদিগের সামাজিক জীবনের উপাদানে মিশ্রিত হইয়া একটি স্থানীয় ও লৌকিক ভাষা পরিগ্রহ করে, কালক্রমে তাহাই বাংলার সর্বত্র প্রচার লাভ করে।"[৭২] অনুমাণটিকে গ্রাহ্য করিলে ইহা অবশ্যই সমর্থন করিতে হয় যে কোচ অর্থাৎ রাজবংশী সমাজে প্রচলিত শিব

পূজায় আদিম শৈবানুষ্ঠানের কতক কতক রীতিপদ্ধতির সাক্ষাৎ আজও মিলিত পারে। যাহাই হউক এই শিবও কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষি-দেবতা। বিশেষতঃ শৈব প্রতীকগুলি বিশ্লেশণ করিলে, যেমন বৃষ, সর্প, লিঙ্গ ইত্যাদির মূলে একান্তভাবে যে কৃষিভাবনা ছিল তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। যথাস্থানে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

উত্তরবঙ্গে শিব নানা নামে ও রূপে পূজা ও মান্য পাইয়া আসিতেছেন। শিবের এই জাতীয় আঞ্চলিক নাম ও রূপগুলিকে গ্রামঠাকুর হিসাবেও অনুমান করা যায়। সুতরাং তাঁহাদের মূলে কৃষিকৃত্যের পরিকল্পনা থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কৃষিভাবনা ব্যতিরেকেও ইঁহাদের পূজার মূলে অন্য কোন কারণ সংগুপ্ত থাকাও অসম্ভব নহে। যেমন উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের ধারণায় মহাকাল হইতেছেন ব্যাঘ্রদেবতা। ইহাদের আরও একজন ব্যাঘ্র দেবতা আছেন, তাঁহার নাম সোনারায়।

উত্তরবঙ্গ একদা ঘন বনাঞ্চলে আবৃত ছিল, সুতরাং হিংস্র শ্বাপদের অত্যাচার কম ছিল না বলিয়া মনে হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে কৃষিকেন্দ্রিক বিশুয়া কৃত্যটিকে হিংস্রজন্তুর অত্যাচার প্রতিহত করিবার যৌথ আক্রমণের স্মরণিকা হিসাবে ধরা যাইতে পারে। ব্যাঘ্রভীতি দূরীকরণের জন্য যদি মহাকাল ঠাকুরের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে হিংস্র জন্তুর অত্যাচারজনিত ভীতি ভাণ্ডানী দেবীর স্রষ্টা এমন অনুমান অসঙ্গত নহে। বনের কাষ্ঠ সংগ্রহকারীদের দ্বারা পূজিতা শালেশ্বরী ঠাকুরাণীও সম্ভবতঃ এই জাতীয় দেবতা। ঝাড়জঙ্গল ঘেরা কেবল বাঙলাদেশে নহে, প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে সর্পভীতির কারণটি মনসা ওরফে রাজবংশীদিগের বিষহরিকে জন্মদান করিয়াছে। নবান্নোৎসবে শিয়াল ঠাকুরের নামে অর্ঘ্যদান অভিনব তথা কৌতুহলোদ্দীপক।

ব্যাঘ্রভীতি ভল্লুকভীতি মহাকাল সোনারায় ভাণ্ডানী শালেশ্বরী পূজার মূলে থাকিলে ইহাকে পশু-পূজার নামান্তর বা রূপান্তর বলা যাইতে পারে কিনা তাহা ভাবিতে হইবে। কেননা পৃথিবীর অনেক আদিমজাতির মধ্যে পশুপূজার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজবংশী সমাজে এই জাতীয় কৃত্যের সন্ধান মিলে, যেমন বৎসরে একাধিকবার গোজাতির পরিচর্যা ইহারা করিয়া থাকে। গোরথনাথ ঠাকুরের নামটির তাৎপর্যও খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

কালী দেবীও এই অঞ্চলের রাজবংশী সমাজে প্রচুর মান্য পাইয়া আসিতেছেন এবং তিনিও কৃষির সঙ্গে এবং ইহলৌকিক নানাবিধ সুখদুঃখের কারণ সৃষ্টির সহিত জড়িত। দশমহাবিদ্যার দশরূপা ব্যতিরেকেও উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন নামের কালীর সহিত আমরা পরিচিত হইতে পারিব। তন্ত্রবিহিত কালী সাধনার একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র এই উত্তরবঙ্গ ছিল বলিয়া মনে হয়।

বৃক্ষোপাসনাও রাজবংশী সমাজে সুপ্রচলিত। প্রত্যেক রাজবংশীর বাড়ীতে তুলসীমঞ্চ থাকিবেই এবং যাবতীয় পূজা-অনুষ্ঠান সেইখানেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। বন্ধ্যাত্বমোচন কিংবা শিশুর দীর্ঘজীবন কামনায় জিগাগাছের পূজা বা তাহার সহিত সখীত্ববন্ধন ও বট-পাকুড় গাছের বিবাহ দান অভিনব ব্যাপার। অপদেবতার কুদৃষ্টি এড়াইবার জন্য পথপার্শ্বস্থিত গাছে খড় ইত্যাদির জুড়া অর্থাৎ নুরা জাতীয় বস্তু ডালে বাঁধিয়া দেওয়া হয় কিংবা গাছের গোড়ায় ছুড়িয়া দেওয়া হয়। জলপাইগুড়ি কোচবিহার দার্জিলিঙ জেলায় এই জাতীয় দেবতার নাম জুড়াবান্ধা ঠাকুর, আবার পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলায় ইহার সহিত পীরযুক্ত হইয়া জুনাপীর হইয়া গিয়াছে। বড় বড় গাছের নীচে থান তৈয়ারী করিয়া পূজাদানের ব্যাপারটির সহিত কোন না কোন ভাবে বৃক্ষপূজার সম্পর্ক লুক্কায়িত থাকা অসম্ভব নহে। রাজবংশীদিগের কৃষিকৃত্যগুলির অনেক স্থলেই গাছের সহিত সুনিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। বিশুয়া অনুষ্ঠানে গাঁজা, পানিমুথারি প্রভৃতি জাতীয় লতাপুষ্পের অংশ চালে গুঁজিয়া দেওয়া হয়। গচিবুনা অর্থাৎ ধান্যরোপণের আনুষ্ঠানিক কর্মে কলা গাছ, কচু ও পাট গাছ প্রভৃতি উপাদানের প্রয়োগও এতদ্‌প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। বাঁশখেলা মদনকাম প্রভৃতি উৎসবে বিচিত্র বর্ণ সুসজ্জিত বংশদণ্ড বহন ব্যাপারটির মধ্যে বাঁশ পূজার ইঙ্গিত যে লুকাইয়া নাই, তাহা বলা যাইবে না।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর নীহারঞ্জন রায় বলিয়াছেন: "প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন.....নানাপ্রকারের ধ্বজাপূজা ও উৎসব এক সময় আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না,.....সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোম এবং বাঙালীর তথাকথিত অন্ত্যজ জনসাধারণের মধ্যে কোন ধর্মকর্ম ধ্বজা এবং ধ্বজাপূজা ছাড়া

অনুষ্ঠিতই হয় না প্রায় বলা চলে।"[১০] মন্তব্যটি যাথার্থ্য দাবী করিতে পারে। তুলসীমঞ্চে, গ্রামঠাকুরের থানে, বিবহরি এবং অন্যান্য দেবদেবীর মন্দিরে, এমন কি সাময়িকভাবে নির্মিত পূজা বা উৎসবমণ্ডপেও সাদা ও লাল রঙের পতাকা লম্বা বাঁশের দণ্ডে উড়িতে দেখা যায়। কতক কতক অঞ্চলে তুলসীমঞ্চের পার্শ্বের পতাকাটিকে হানুমান ঠাকুরের প্রতীক বলিয়া পূজা করা হয়। ইহা প্রাচীন ভারতীয় প্রথার কপিধ্বজের ক্ষীণ স্মৃতি কিনা দেখা দরকার।

শারদীয়া দুর্গোৎসবের নবমী এবং কোথাও দশমীর দিনটিকে রাজবংশীরা যাত্রাপূজার দিন বলিয়া পালন করিয়া থাকে। হলযাত্রা, গবাদি পশুর পরিচর্য্যা ইত্যাদি কৃত্য থাকিবার হেতু ইহাকে কৃষিপূজাই বলিতে হয়। লক্ষণীয় যে যাত্রাপূজার অন্যতম অঙ্গ সরস্বতীদেবীর পূজা। দুর্গা ও সরস্বতীপূজায় যে রীতি পদ্ধতি অধুনা প্রচলিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত আধুনিককালের বলিয়া মনে হয়। কেননা এই পূজা দুইটিতে রাজবংশীদের নিজস্ব পুরোহিত অধিকারীর পূজার কোন অধিকার থাকে না। অথচ অধিকারী দ্বারাই পূজাপ্রদান রাজবংশী সমাজের আদি ও প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। যাত্রাপূজার দিনে সরস্বতী পূজাটিকেই আমরা এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত বাণীবন্দনা বলিয়া আনুমান করিতে চাই।

লক্ষীপূজা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা অনুরূপ। প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজার দিন হিসাবে সাধারণ বাঙালী সমাজে যাহা ধার্য্য রাজবংশী সমাজে তাহা দেখা যায় না। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজাটিও বাঙালী সমাজের নিকট রাজবংশীগণ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং আমাদের অনুমানে ক্ষেতি বা ডাকলক্ষ্মীর পূজাটিই ইহাদের আদি ও অকৃত্রিম লক্ষ্মী-অর্চনা।

উত্তরবঙ্গ দীর্ঘদিন মুসলমান শাসনাধীনে ছিল। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়দ্বয় পাশাপাশি বসবাস করিবার ফলে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে ঐস্লামিক কিছু ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটিতে দেখা যায় যাহা বাঙালী হিন্দুর অপরাপর শাখাগুলিতেও অল্পবিস্তর সংঘটিত হইয়াছে। সত্যপীর, পাগলাপীর, মাদারপীর প্রভৃতি মুসলমান দেবতার পূজা উৎসব এবং শিরনীদান প্রথা, ব্যাড়াভাসান প্রভৃতি অনুষ্ঠান হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সমগ্র বিষয়টিকে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার চেষ্টা করা হইয়াছে।

অংশগ্রহণ-করণের দিক হইতে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত পূজা-উৎসবসমূহকে মোট তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা ১) পাগলাপীর, চোরখেলা, ভাণ্ডার ঘর ছুবা, বুড়াবুড়ী, হকাহকি এবং আমাতির শেষ পর্যায়টি একান্ত ভাবে বালকদের মধ্যে সীমিত, ২) ধানের ফুল আনা, মেচেনী খেলা, হুদমাখেলা, ব্যাড়াভাসান প্রভৃতি অনুষ্ঠান কেবলমাত্র নারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং ৩) অন্যান্য প্রায় সবগুলিই বয়স্ক পুরুষ পরিচালিত।

প্রবাদে বলে 'বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ'। রাজবংশী সম্প্রদায়টির মধ্যেও পূজা-উৎসবাদি কম নহে। ইহার মূলে মুখ্যতঃ দুইটি কারণ সক্রিয় বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ কৃষি কর্ম্মের স্তরগুলিতে একটি হইতে অন্যটির মধ্যখানে সাময়িকভাবে একটি অবসর থাকে। এই অবকাশ যাপনের সুযোগ হইতে নানাবিধ দেবদেবী, পূজা-উৎসব-সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদির কল্পনা সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কৃষিকর্মে প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা কাটাইবার উদ্দেশ্যে কৃষকের অসহায় আদিম মানসিকতা স্বাভাবিকভাবে জাদুনিয়ন্ত্রিত কৃত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। রাজবংশীদিগের কৃষিকেন্দ্রিক অধিকাংশ পূজা উৎসবগুলির মধ্যে জাদুবিশ্বাসের তীব্রতা লক্ষ্য করিতে পারিব।

"আদিম সমাজে উৎসব অনুষ্ঠান দেবতা নৃত্যগীতি কাহিনী কাব্য একই কৃত্যের আধারে মিলেমিশে ছিল; সমাজের ক্রম-রূপান্তরে জাদুবিদ্যা যেমন ধর্মে ও বিজ্ঞানে উপনীত, তেমনি নাচ গান কথা ইত্যাদি পটভূমি সরে সরে গিয়ে বিশুদ্ধ শিল্পরূপ নিতে থাকে, পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়ে বিকশিত বিবর্তিত হতে থাকে নিজ নিজ কক্ষপথে,.....তখন স্বকীয় স্বতন্ত্র পথে রূপ ও রূপান্তর লাভ করে তত্ত্ব দর্শন কথা কাব্য নৃত্য গীত শিল্প সাধন কৃত্য ধর্ম দেবতা। সংস্কৃতি হয় দ্বিধাবিভক্ত, কাল প্রবাহে বহুধাবিভক্ত যেমন একটি সমাজ ভেঙে পরিণত হয় বিভিন্ন শ্রেণীতে সম্প্রদায়ে।"[১১] রাজবংশী সমাজের পূজা-উৎসব-সঙ্গীত ব্যাপারেও এই সত্য থাকিতে পারে। ইহাদের অধিকাংশ পূজাপার্বণের সহিত উৎসব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিশুয়া নয়াখৈ পুষুনা ক্ষেত্রিলক্ষ্মী দীপান্বিতা চড়ক প্রভৃতি কৃত্যে পূজা ও উৎসবকে পৃথকভাবে দেখা যায়না। আবার অনেক পূজা-উৎসবের সহিত সঙ্গীত সুনিবিড়ভাবে সংযুক্ত, যেমন তিস্তাবুড়ি, সোনারায়, মদন কাম

চড়ক প্রভৃতি। গান গাহিয়া চাউল সংগ্রহ করিয়া সেইগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা পূর্বোক্ত পূজাগুলির ব্যয় নির্বাহ করা হইয়া থাকে। বিবাহ বা মানসিক কারণে বিষহরি ও সত্যপীরের পূজায় সঙ্গীতই মুখ্য ব্যাপার। বিষহরি, সত্যপীর প্রভৃতি পালাবদ্ধ গানে পুরুষেরা স্ত্রী-বেশে নৃত্য পরিবেশন করে। বিষহরির ভাসানে সাপের ভঙ্গীতে নৃত্য পরিবেশনের মধ্যে অভিনবত্ব আছে। অন্যান্য সঙ্গীত শাখাগুলিতে সামান্যভাবে নৃত্যের লক্ষণ মিলে। উৎসবকেন্দ্রিক সঙ্গীতগুলিকে প্রকল্পভুক্তির কারণ বলিলে বলিতে হয় যে এইগুলির মধ্যে উত্তরবঙ্গের লৌকিক ভাষা, দেবদেবী সম্পর্কিত রাজবংশীদের ধারনা ও বিশ্বাসের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। পালাবদ্ধ নহে এমন বিক্ষিপ্ত সঙ্গীতগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, চাওয়া-পাওয়া, মানুষের স্বভাব চরিত্র, সমাজের রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ের সহিত পরিচিত হওয়া যাইবে। উপরন্তু শিক্ষিত শ্রেণী কর্তৃক অবহেলিত সমাজের নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর মানুষগুলির মধ্যেও যে মাধুর্যমণ্ডিত কবিকল্পনা থাকিতে পারে এই সঙ্গীতসমূহ তাহার কিছুটা ইঙ্গিত দান করিতে পারিবে।

রাজবংশী সমাজে প্রচলিত পূজানুষ্ঠানগুলিতে ব্যবহৃত মন্ত্রাবলী অত্যন্ত সমাদরের সহিত আমরা প্রকল্পভুক্ত করিয়াছি। কেননা, প্রথমতঃ—এইগুলির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সমাজটির ইহলৌকিক চাওয়া পাওয়া সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যাইবে, দ্বিতীয়তঃ—সঙ্গীতগুলির মত ইহাদের সহায়তায় উত্তরবঙ্গের গ্রামীন ভাষার সহিত সামান্যভাবে পরিচিত হওয়া যাইবে এবং তৃতীয়তঃ—দেবদেবীদের প্রকৃতি ও স্বরূপ জানিতে মন্ত্রগুলি মুখ্য সহায়কের কাজ করিতে পারিবে। গ্রামীন পরিবেশে লৌকিক নামের অন্তরালে বেদ-পুরান-তন্ত্রের কোন দেবদেবীর অদৃশ্য প্রভাব কাজ করিতেছে কিনা উহাও আমরা মন্ত্রগুলির সহায়তায় জানিতে সুযোগ পাইতে পারি। কিছু কিছু অনুষ্ঠানে ছড়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মন্ত্রোচ্চারিত কামনা-বাসনার মতই ছড়া-সমূহের বক্তব্য প্রকাশ পায় অতএব সেইগুলিকেও আমরা মন্ত্র অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

রাজবংশী সমাজের যাবতীয় পূজা পার্বণাদি তাহাদের নিজস্ব পুরোহিতের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। মূল প্রকল্পের মধ্যেই আমরা এতদবিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করিয়াছি। বিষয়টিকে পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া যাইত। কিন্তু পূজারীদের সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারনা জন্মিলে এই সমাজের পূজা-উৎসবগুলির স্পষ্ট চিত্র হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর হইবে না বলিয়া মনে হয়। তাই, বিষয়টিকে প্রকল্পবহির্ভূত না করিয়া অগ্রাধিকার দেওয়া হইতেছে।

বিংশ শতকের ভারতবর্ষে কোন প্রাচীন সমাজই আদিম ভাবধারা লইয়া সম্পূর্ণভাবে চলিতেছেনা, আধুনিকতার অপ্রতিরোধ্য ভাবধারার সহিত সমন্বয় সাধনের প্রবণতা প্রত্যেকটি সমাজেই লক্ষ্য করা যাইতেছে, এবং অতএব আমাদের প্রকল্পধৃত সমাজটিও যে ইহার সামিল হইতে চেষ্টা করিবে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। রাজবংশীদিগের আচার-ব্যবহার, ভাষা-ভঙ্গী, এমন কি বলা যায় ইহাদের দৈহিক গঠনও বুঝি পরিবর্তনের পথে ঝুঁকিতেছে। এই দ্রুত পরিবর্তনের মুখে রাজবংশীদিগের আচরিত ধর্মকর্মানুষ্ঠানের অনেকগুলিই আজ প্রায় লুপ্ত হইয়াছে বা হইতে চলিয়াছে। ফলে অনেক দেবদেবীর কেবল নাম মাত্র পাওয়া যায়, পূজা বা অনুষ্ঠানের কোন নিদর্শন মিলেনা। ইহার কারণ একাধিক। সাধারণভাবে কারণগুলি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে :—

প্রথমতঃ উত্তরবঙ্গ বলিতে একদা কোচ-মেচ প্রভৃতি লোকদেরই যে দেশ বুঝাইত তাহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মহারাজ বিশ্বসিংহ এবং তৎপুত্র মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহাদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রধান প্রধান সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি হইতে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গে স্থায়ী অ-রাজবংশীদের মধ্যে সম্ভবতঃ ইঁহারাই প্রথম স্থায়ী বাসিন্দা। ইংরাজ আগমনের পূর্বে কোচবিহার রাজ্যের কিছু অংশ ভুটানের শাসনাধীনে ছিল। ভোটপাটী, ভোটবাড়ী, ভোটের হাট, ভুটুনীর ঘাট প্রভৃতি স্থানের নাম হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে ভুটিয়ারা এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিল। স্থানীয় মুসলমানগণ তো এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী গৌড় রাজ্যের অ-রাজবংশী সমাজ পশ্চিমদিনাজপুর হইয়া উত্তরবঙ্গের অন্যত্র সামান্যভাবে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। তথাপি মালদহের উত্তরাংশসহ উত্তরবঙ্গের অন্য চারটি জেলাতে কোচ রাজবংশী পলিয়া দেশিয়াদেরই প্রতিপত্তি ও সংখ্যাধিক্য ছিল বলা যায়। কিন্তু দেশ-বিভাগের সময় ও পরে পূর্ব পাকিস্তান হইতে দলে দলে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু আসিয়া উত্তরবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে শুরু করে। এই সকল উদ্বাস্তুদের মধ্যে অ-রাজবংশী হিন্দুই বেশী ছিল। ফলে গোষ্ঠীবদ্ধ ও সংরক্ষণশীল সমাজটি বৃহত্তর বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির সহিত সহাবস্থান করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং ঐতিহাসিক কারণে দেশ-বিভাগজনিত পরিস্থিতির দরুণ রাজবংশীদের মধ্যে পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা দিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ—রাজবংশীদিগের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত মান ভাল নহে জন্য ইহারা তফসিলভুক্ত শ্রেণীতে পড়ে এবং তজন্য শিক্ষার উন্নতিকল্পে সরকার হইতে তফসিল শ্রেণীভুক্ত শিক্ষাবৃত্তির সুযোগ পাইয়া আসিতেছে। ফলে রাজবংশীদের মধ্যে সন্তোষজনকভাবে না হইলেও ক্রমে ক্রমে শিক্ষার প্রসার ঘটিতেছে এবং তাহারা ক্রমশঃই শহরমুখী হইতে চেষ্টা করিতেছে। ভারত সরকার কর্তৃক জমিদারী প্রথা বিলুপ্তিকরণের আইন ইহাদিগকে জমির আকর্ষণ হইতে টানিয়া লইয়া শিক্ষাগ্রহণের দিকে ঝুঁকিতে সাহায্য করিয়াছে। বস্তুতঃ কৃষি-নির্ভর সমাজটি এতাবৎকাল জমি জায়গা সংসার লইয়াই নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু উৎপাদনের অনিশ্চয়তা অপেক্ষা লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরী লইয়া মাসান্তে একটি নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত আয় অধিকতর সম্মানজনক বিবেচনা করিয়া মোটামুটি সমগ্র সমাজটি শিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু সামান্য সংখ্যক লোকের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইতে শুরু হইয়াছে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে প্রথাটিরও প্রসার ঘটিতে পারে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ—আধুনিকতার অনতিক্রম্য প্রভাব সকল গ্রামীন সমাজগুলির উপর কমবেশী পড়িতেছে। শহরের সহিত নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠতার যোগ, সিনেমা, বিভিন্ন সমাজের সহিত নৈকট্য, বিজ্ঞানের সহায়তায় দূরদেশে যাতায়াত বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণেও রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রচ্ছন্ন রূপান্তর হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

চতুর্থতঃ—রাজবংশীদের অর্থনৈতিক দুরবস্থাও প্রাচীন ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানগুলি পালনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ। উদ্বাস্তু আগমনের ফলে জমির প্রতি আকর্ষণের তীব্রতা হ্রাস পাইতেছে: তাই জীবিকা নির্ব্বাহের হেতু কৃষি-নির্ভর সমাজটি ইদানীংকালে ব্যবসা ও অন্যদিকে ঝুঁকিতে শুরু করিয়াছে। সেইজন্য স্বাভাবিকভাবেই কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলি অ-কৃষক রাজবংশীদের এখন আর তেমনভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না।

পঞ্চমতঃ—বর্তমান যুগে বাঙলা বা ভারতবর্ষে প্রায় কেহই রাজনীতি-নিরপেক্ষ থাকিতে পারিতেছে না। কমবেশী প্রত্যেকে কোন না কোন দলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরাও সর্ব্বভারতীয় দলগুলিতে অংশ লইতেছে। রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য একই আদর্শের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার ফলে ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে একপ্রাণতা ও জাতীয়তাবোধের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতেছে; অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে। ফলে আদর্শায়িত বৃহত্তর সংস্কৃতির প্রভাবে আঞ্চলিক সংস্কৃতিটি বিবর্তনের পথে পা বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে একটি বিশাল ভূখণ্ডের অতি প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে কাজে হাত দেওয়া অসমীচিন হয় নাই বলা যায়। প্রকল্পটির মধ্যে যে চমৎকারিত্ব রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ তথা বাঙ্গালীজাতির ইতিহাস প্রণয়ণে আহৃত তথ্যগুলির সামান্য প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলেও আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব।

আমরা কিছু পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে রাজবংশীদের মধ্যে আচরিত ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানগুলির অনেকগুলিই আজ অবলুপ্তির পথে। এই বিলুপ্তির জন্য দায়ী কেবল উপরে বর্ণিত বিষয়গুলিই নহে। ইহার মূলে অন্য একটি কারণও মুখ্যতঃ ক্রিয়াশীল। তাহা হইল রাজবংশী সমাজের নিজস্ব পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংরক্ষণশীলতা ও পূজাপদ্ধতির মন্ত্রাবলীর প্রতি অসাধারণ মমত্ববোধ। মন্ত্রগুপ্তির স্বাভাবিক প্রবণতাই মন্ত্রের সম্প্রসারে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবেও অনেক আভিচারিক ক্রিয়াকর্ম্মের রীতিপদ্ধতি, মন্ত্রাবলী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রাজবংশী সমাজের পুরোহিতদের মধ্যে এই ধারণাটি অত্যন্ত ব্যাপক যে একটি মন্ত্র অধিক লোকের জানিত হইলে উহার কার্যকরী ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। ফলতঃ সর্প-দংশন ও রোগাদি দূরীকরণের অনেক লোকহিতকর মন্ত্র এবং তৎসংশ্লিষ্ট ক্রিয়াগুলির কোন হদিস এখন আর পাওয়া যায় না। ইহার মূলে হয়তো আরও অন্য কোন কিছু কারণ থাকিতে পারে। যেমন প্রতিযোগিতার বাজারে গুনীন্ তাহার ব্যবসায়িক কারণে মন্ত্র হাতছাড়া করিতে চাহে না,—যদি সেটির ক্ষমতা বিনষ্ট হইয়া যায়; কিংবা মন্ত্রতন্ত্রের প্রতি আধুনিক লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা নাই জন্য যোগ্য উত্তরাধিকারী পাইবার অসুবিধা ইত্যাদি। সুতরাং বর্ত্তমান প্রকল্পটি লইয়া অগ্রসর হইবার অর্থ একটি বিরাট ঝুঁকি মাথায় পাতিয়া লওয়া। তথাপি সামগ্রিকভাবে আলোচনাটিকে তথ্য সমৃদ্ধ করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য করিয়াছি।

নির্দ্দেশ তালিকাঃ—

১। দ্রষ্টব্য : Kirata jana Kriti—Dr. S. K. Chatterjee, (1951), Page—3

২। দ্রষ্টব্য : Origin and Development of the Bengali Language—Dr. S. K. Chatterjee, (1926) Part-I, Page—26-27

৩। বিরজাশংকর গুহ মহাশয় ৯টি শাখা সমেত মোট ৬টি মুল মানবগোষ্ঠীর তালিকা দিয়াছেন। দ্রঃ— Kirata jana Kriti. Page—4

৪। দ্রঃ— বাঙালীর ইতিহাস—শ্রীনীহার রঞ্জন রায় (শ্রীজ্যোৎস্না সিংহ রায় কর্ত্তৃক সংক্ষেপিত সংস্করণ, ১৩৭৩) পৃঃ—২৪-৩৩

৫। ঐ—পৃঃ—২৮

৬। তুলনীয়—ক) "ভারতবর্ষ বিসদৃসকেও সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে"। স্বদেশ/ভারতবর্ষের ইতিহাস—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ—৪৪

খ) "ভারতবর্ষ পুলিন্দ শবর ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে"। ঐ—পৃঃ—৪৬

৭। বাঙালীর ইতিহাস (সংক্ষেপিত সং), পৃঃ—৩৫-৩৬

৮। জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৯। দ্রঃ—Kirata-jana-Kriti—Page—7

১০। O. D. B. L—Page—62

১১। "আর্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পুর্বেই যে বর্ত্তমান বাঙালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়"।— বাংলাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাচীন যুগ, ৪র্থ সং, ১৩৭৩, পৃঃ—১৩

১২। "বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্ম্মী আসার পর-পীড়কদের জীবনচরিত মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।……"
—বঙ্গদর্শন/বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, ১২৮৯, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

১৩। প্রথম প্রকাশ—মাঘ, ১৩৫৬। পরে দুই একখানি কিশোর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীজ্যোৎস্না সিংহ রায় 'সংক্ষেপিত সংস্করণ' বাহির করিয়াছেন, ফাল্গুন ১৩৭৩-এ। 'লেখক সমবায় সমিতি', কলিকাতা ২৬ হইতে প্রকাশিত।

১৪। দ্রষ্টব্য গ্রন্থের ভূমিকা—"যাহাই হউক, রাজাদেশ প্রতিপালনের স্বাভাবিক আগ্রহই এই লেখকের পক্ষে এতাদৃশ গুরুতর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার একমাত্র হেতু ;…" ইত্যাদি।

… The Asiatic Society কর্ত্তৃক প্রকাশিত। Monograph Series, Volume—XI.

… to give on idea of the flok-life and flok culture

২৭। দ্রঃ—কোচবিহারের ইতিহাস

২৮। বাঙালীর ইতিহাস—সংক্ষেপিত সংস্করণ, পৃঃ—৪৩৩

২৯। দ্রঃ—Hand book on Scheduled Castes and Scheduled Tribes of West Bengal—A. K. Das, B. K. Roychoudhury and M. K. Raha. (1966) Page—96

৩০। দ্রঃ—Descriptive Ethnology of Bengal—E. T. Dalton, Reprinted Edition, (1960). Page—89

৩১। Statistical Account of Bengal—W. W. Hunter, vol-X, Page—402

৩২। The Tribes and Castes of Bengal—H. H. Risely, vol-I, Page—491

৩৩। Vol—III, Page—262

৩৪। Journal of Asiatic Society of Bengal, vol-XVIII, Part II, Pages—704-706

৩৫। Vol—III, Part-II, Page—95

৩৬। আক্রমণের কাল ১২০৩ বা ১২০৫ খৃঃ

৩৭। দ্রঃ—Kirata-jana-Kriti, Page—54

৩৮। Imperial Gazetteer, 1908, vol-X, Page—383

৩৯। দ্রঃ—রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস—শ্রীউপেন্দ্র নাথ বর্ম্মন, (১৩৭০), পৃঃ—১০-১১

৪০। ঐ পৃঃ—২১-২২

৪১। দ্রঃ—O. D. B. L—Part I, Page—69

৪২। ঐ—79

৪৩। ঐ—78-79

৪৪। দ্রঃ—History Antiquity Topography and Statistics of Eastren India—Montogomery Martin, 1933, Page—538

৪৫। The Census Report of Bengal—1872, vol-I, Page—130

৪৬। The Tribes and Castes of Bengal—1891, vol-I, Page—491

৪৭। Census of India—1931, vol-V, Part-1, Page—473

৪৮। Kirata-jana-Kriti, Page—61

৪৯। দ্রঃ—রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, পৃঃ—২৫-২৬

৫০। দ্রঃ— ঐ

৫১। "পরশুরাম ভয়াৎক্ষত্রি সংকোচৎ কোচ উদ্ভতে"।

৫২। দ্রঃ—ক) কোচবিহারের ইতিহাস, পৃঃ—৪

খ) কোচ-রাজবংশী জাতির ইতিহাস আর্য্য সংস্কৃতি—শ্রীঅম্বিকা চরণ সরকার, (বঙ্গাইগাঁও, আসাম, ১ম সংস্করণ ১৯৬৯) পৃঃ—১১

৫৩। শ্রীআর, সি, চন্দ এই অনুমান করিয়াছেন, দ্রঃ—O. D. B. L, vol-I, Page—69

৫৪। ঐ, পৃঃ—৬৯

৫৫। Kirata jana Kriti Page—61

৫৬। কোচবিহারের ইতিহাস—পৃঃ—৪

৫৭। ঐ, পৃঃ—৪, পাদটীকা—৬

৬৭। দ্রঃ—Cultural Heritage of India, vol-II, Part-I

৬৮। দ্রঃ—History of Dharmasastra—P. V. Kane, Bhandarkar Oriental Research Institute-(Poona, 1958,) vol-V, Part-I

৬৯। বাংলার ব্রত পৃঃ—৭

৭০। ধৃ+ম (কর্মবাচ্যে)

৭১। দ্রঃ—ক) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, ১ম প্রকাশ, ১৩৬৩

খ) বাংলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৬

গ) সীমান্ত বাংলার লোকযান—ডঃ সুধীর কুমার করণ, ১ম সংস্করণ ১৩৭১

ঘ) বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

৭২। বাঙলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃঃ—১০৪

৭৩। বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃঃ—২৯৭-৯৮

৭৪। বাংলা কাব্যে শিব পৃঃ—৩